সাবজেক্ট অথবা গিনিপিগ অথবা গেরিলা

শংকর সেনগুপ্ত

ট্রেন বিকেল চারটেয় ছাড়বে। আমার স্ত্রী ও মেয়ে একটা কুপে, দুজনেরই লোয়ার বার্থ। আমারটা লোয়ার বার্থ, তবে দুটো কুপ পরে একই কামরায়। মালপত্র যেখানে যেখানে ঢোকানোর দরকার, তা তদ্রুপ করে ফেলা হয়েছে। ট্রেনটা যোধপুর ছাড়বে। রাজস্থান ঘুরতে বেরিয়ে ছিলাম। ফিরে যাচ্ছি, মেয়ের কলেজ খুলে যাবে সামনের সপ্তাহে। আমার সামনের লোয়ার বার্থটা একটা বাঙালি ছেলের ভাগ্যে জুটেছে। একটু যেন স্বস্তি পেলাম। দুই রাত্রি পার করতে হবে। একটা কথার বলার লোক যদি না থাকে, তবে তো এই দীর্ঘ সময় কাটানো মুশকিল। গিন্নী আর মেয়ের সিটটা অন্য কুপে পড়েছে। তবু ভালো লোয়ার বার্থ। ভাবছিলাম সামনের বাঙালি ছেলেটাকে বলে, সিটটা চেঞ্জ করে নেওয়া যায় কিনা। কিন্তু সমস্যাটা হল দুজন। ওদের দুজন এক জায়গায় তবু ভালো। ওদের একজন কে আমার অপোজিটে এই কুপে নিয়ে আসলে, মা ও মেয়ে যে কেউ সেই একাই হয়ে পড়বে। অতএব ওই চিন্তাটা ছেড়েই দিলাম।

ট্রেনের জার্নি আমার ভীষণ ভালো লাগে। এই যে কয়েকদিন আগে হাওড়া থেকে বেরিয়ে এলাম, মনটা তখন অন্য এক আনন্দে টগবগ করছিল। ওটা যে শুধু রাজস্থান দেখতে বেরনোর জন্য এমনটা নয়—আসলে রেলগাড়ির চাকার আওয়াজ, জানলা দিয়ে দেখি যখন জগৎটা ছবির মতো ছুটছে, আমার মনের মধ্যে এক উদাসীন, পালানো মনোভাবের আনন্দ অনুভূত হতে থাকে। এটা আমার বরাবরের একটা সুখ বা অসুখ— যদিও আমি যে ভ্রমণের জন্য ট্রেনে খুব যাতায়াত করি এমনটা নয়। যাই হোক, ট্রেন তো যোধপুর অনেকক্ষণ আগেই ছেড়ে চলে এসেছে। যাত্রীরা সবাই যে যার মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। বেশিরভাগই দূরপাল্লার যাত্রী। শুধু যে রাজস্থানের লোকই বেশি এমনটাও নয়। সব প্রদেশের লোকই আছে। বাঙালি ছেলেটা আর আমি মুখোমুখি, আর দুজনেই জানালার পাশে। ছেলেটা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। বড় জোর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। যাকগে সেটা পরে জানা যাবে।

এখানে কী, মানে যোধপুরে চাকরি-বাকরি করেন।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

না না, আমি যোধপুরে থাকি না। এখানে এসেছিলাম এক বন্ধুর কাছে, দিন পাঁচেক থেকে গেলাম।

এখন কোথায় যাবেন?

যাব কলকাতায়ই, তবে আমি থাকি হরিয়ানায়। ওখান থেকে যোধপুরে কটাদিন কাটিয়ে, কলকাতা যাচ্ছি।

হরিয়ানায় ফিরে যাচ্ছে না, ভালোই হল, তাহলে আমরা একেবারে হাওড়া অবধি একসাথে থাকব।

ছেলেটির বেশভূষা মোটমুটি ঠিকই আছে। আজকাল জামা-কাপড় দিয়ে কোনও কিছু পরিমাণ করা মুর্খের কাজ। তবে ছেলেটি সংযত, শান্ত, ব্যবহারে বিনয়ী। খুব সম্ভবত কিছু চাকরি-বাকিরি করে না। চোখ মুখ যথেষ্ট শার্প ও গায়ের রং ফরসা। চোখটা বেশ বড় কিন্তু যেন মনে হয় বড় বেশি ক্লান্ত। শরীরের স্ট্রাকচারটা বেশ ভালোই কিন্তু কোথায় সর্বত্র একটা ফ্যাকাশে ভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এর মধ্যে আমার বার দুয়েক চা খাওয়া হয়ে গেল। ওই ছেলেটিকে নিয়ে পাশের কুপে আমার স্ত্রী ও কন্যার সাথে আলাপ করিয়ে নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী, কন্যা যে খুউব একটা ইমপ্রেসড হল, মনে হল না। তবে ওরা বুঝল আমি একটু চাপা স্বভাবের, এমনিতে মুখের হাসিটি লেগে আছে। মুখের হাসিটা কেন জানি কিছুটা ম্লান, থাক তাতে কিছু এসে যায় না। আমার আগামী ৩৮ ঘন্টার সাথী। ওকে জিগ্যেস করলাম রাতে কি খাচ্ছ।

—রাতে যাই হোক একটা খেয়ে নেব। এই তো হকাররা হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করেছে— মেসোমশাই আপনারা কি খাবেন।

—আমরা যোধপুরে, একটা আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেছিলাম। ওঁরা রাতে ডিনারটা আমাদের সঙ্গে প্যাক করেই দিয়েছে। তুমিও আমাদের সঙ্গে খেয়ে নিতে পার।

রাত ন'টা। অন্ধকারের বুক চিরে রাতের গভীর নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে খান খান করে ট্রেন ছুটে চলেছে। ট্রেনের ভিতরে, কামরায় এক আলোময় অন্য জগৎ। সেখানে লোকেরা কথা বলছে, খাওয়া দাওয়া সারছে। ব্যবসা বাণিজ্য, সাংসারিক জীবনে এসব ছাড়াও জীবনের প্রতিটি স্তর ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলার সেই ছড়াটা এখনও স্মৃতিতে লটকে আছে। ধায় গাড়ি, ধুম গাড়ি, দুনিয়া কাঁপায়। অরিন্দমের না না, করা শব্দটার মধ্যে ওর ভিতরের সেই এক ইন্ট্রোভার্ট সত্তা বা আত্মসম্মানের এক সুর যেন, বিনীত সুরেই বেজে ওঠে। ধায় গাড়ি, ধুম গাড়ি হলেও আমরা একটা বরাবরের কৌতূহল ছিল, এই যে সারাটা দেশের বুক চিরে, বিশেষত গভীর রাত্রে, রেল লাইনের আশেপাশের গ্রামগুলির মানুষের চোখে এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি কী দ্যোতনা জাগায়।

একবার সেই অভিজ্ঞতা হয়েও গিয়েছিল। সত্তরের দশকে আমার এক সাঁওতাল বন্ধু ও কলিগের সঙ্গে ওঁর গ্রামের বাড়ি গিয়ে তিনদিন ছিলাম। ওদের গ্রামটা ছিল গিধনী রেল স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনের ধারে। আমরা কলকাতা থেকে যাবার সময় ঝাড়গ্রাম অবধি ট্রেনে গেলাম, তারপর সেখান থেকে বাসে। গ্রামটার নাম ছিল বনভূম। যুবরাজ, ওর এক বিধবা পিসী, আর আমি বাইরের উঠোনে একটা খাটিয়ায় বসেছিলাম। একটা লণ্ঠন ঝুলছিল একপাশে চরাচর জুড়ে এক নিকশ কালো অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে আকাশ ছুঁয়ে। সেখানে লক্ষ তারা পিটপিট করে জলছে। সমস্ত সাঁওতাল বস্তীটা জুড়ে এক গভীর নৈঃশব্দ্যে। মাঝে মাঝে দু-একটা শেয়াল কুকুরের ডাক। যুবরাজের পিসীই ওকে মানুষ করেছে। ওর বাবা মারা যাবার পর ওর মা আর একজনকে বিয়ে করে দূরের গ্রামে চলে যায়। দূরে গেলেও ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন করেনি। আমরা তিনজন বসে আছি খাটিয়ায়, হঠাৎ কোথা থেকে এক বিকট শব্দ করতে করতে একটা বিশাল এক্সপ্রেস ট্রেন আগুনের বর্ণমালা ছড়াতে ছড়াতে, সেই অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য দুটোকেই অনভিপ্রেত বানিয়ে গম গম করতে করতে চলে গেল। সেই দৃশ্যটা আমি আজও ভুলিনি সেই ট্রেনের কামরাগুলি থেকে বিচ্ছুরিত আলো লাইনের উপর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে এক আলোর অজগর যেন উল্কার গতি নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি ভাবছিলুম, ওই ট্রেনের ভিতরের সমাজও অবস্থা বা ব্যবস্থা, আর কামরা ভর্তি মানুষের সংলাপ, যা কিনা জি. ডি. পি. শেয়াল বাজার, প্রেম ভালোবাসা..., ষড়যন্ত্র, এক উন্নত ভারতের একটা মিনিয়েচার, যে অগ্নিপথে ভারতের উল্কার গতিতে চলে গেল। পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল অন্য এক ভারত, যে কোনও ইনডেক্স এই আসে না; শুধু পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ও বঞ্চনার হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কামরায় যাদের খাবার কথা, তারা সব খেয়ে নিয়ে যে যার জায়গায় চাদর পেতে শুয়ে পড়েছে। আমাদের ও অরিন্দমের খাওয়াদাওয়া সারা হয়ে গেছে। অরিন্দম ও আমি পাশাপাশি শুয়ে পড়েছি। শীত যাই যাই করেও যাচ্ছে না, তাই মোটা এক চাদর গায়ে দিতে হচ্ছে। কামরার আলোগুলি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। টয়লেটের দিকে প্যাসেজের আলোটা শুধু জ্বলছে।

—অরিন্দম, তোমাদের দেশ কোথায় ছিল।

—মেসোমশাই, আমাদের দেশ যদি বলেন, সেটা হল রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, আমার জন্ম রানাঘাটেই। আর বাপ ঠাকুরদার দেশের কথা যদি বলেন সেটা ছিল নাকি ফরিদপুর।

অরিন্দমের কথায়, রেলের দোলানির মধ্যে যেন একটা ধাক্কা খেলাম। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, কারও কাছে দেশ হয়ে গেছে। কুপার্স ক্যাম্প তো উদ্বাস্তু রিহাবিলিটেশনের এক উল্লেখযোগ্য নাম। পরবর্তীকালে কুপার্স আরও অনেক কিছুর জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে। কুপার্স ক্যাম্পের নাম শুনলে এখনও অনেকে ভয় পায়।

—তোমার বাবা কি ওখানেই থাকেন?

—হ্যাঁ, বাবা ওখানেই থাকেন। তবে আমরা কুপার্স ক্যাম্প থেকে একটু সরে এসে সামান্য মাটি কিনেছি। আমার বাবা ওখানেই একটা বেড়ার ঘর বানিয়েছিলেন। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর মাসে মাসে বাবাকে টাকা পাঠিয়ে মেঝে ও দেওয়াল পাকা করে ওপরে এ্যাজবেস্টাস দিয়েছি, মা অবশ্য পুরোটা দেখে যেতে পারেননি।

—তোমার মা নেই।

—ন-না, তিন বছর হল বাবা একাই আছেন।

—তোমার আর কোনও ভাই বোন নেই?

—ন-না, হ্যাঁ ভাই ছিল। আমি পার্ট ওয়ান পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম, যাতে ভাইটা পড়াশোনা করে ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে। ভাইটা পড়াশোনায় ভালো ছিল। ওর পড়াশোনা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই জন্যে বেড়ালাম। নানা জায়গায় ভাসতে ভাসতে হরিয়ানায় গিয়ে দাঁড়ালাম। চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না, তারপর অটো চালাতে শুরু করলাম।

—অটো চালাতে শুরু করলে!

—মেসোমশাই, এই অটো চালিয়ে, বাবাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে, ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে, তিলতিল করে বাড়িটাকে বাসযোগ্য তৈরি করতে, বাবাকে যতখানি সম্ভব সহযোগিতা করার, করে যাচ্ছিলাম।

কামরায় সকলে ঘুমুচ্ছে। নাক ডাকার একটা প্রতিযোগিতা চলছে। রাত যত বাড়ছে অরিন্দম তত প্রগলভ হয়ে উঠছে। ওর ভিতরের ইনট্রোভার্ট ভাবটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

—মেসোমশাই বারো ক্লাস পাশ করার পর বুঝলাম, কুপার্স ক্যাম্প থেকে আর বেশি কিছু করা সম্ভবপর নয়। বাবা তেমন কিছু করতে পারছিলেন না। মনে মনে তখনই ঠিক করে নিলাম, আমি বেরিয়ে যাই, কিন্তু ভাইটা পড়াশোনা কনটিনিউ করুক। আর তা ছাড়া পড়াশোনায় ওর আগ্রহ আর পড়াশোনা করে দাঁড়ানোর এক অদম্য ইচ্ছা ওর আছে। কিন্তু ভাই বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে না এমনটা নয়, যে দু-ভায়ের পড়াশোনা চালানো অসম্ভব, আর তার সঙ্গে চারটে খাণ্ডবের খিদে মেটানো। সেই আমি বাড়ি ছাড়লাম। মেসোমশাই, এ সমাজে লিঙ্ক না থাকলে আমাদের মতো মানুষের ওই স্বল্প শিক্ষার কোনও দাম নেই। দাম যেটার রয়েছে, সেটা গতর খাটানোর। অনেক জায়গা ঘুরেফিরে এসে হরিয়ানায় গিয়ে আস্তানা গাড়লাম। পনেরো বছরের উপর হয়ে গেল রানাঘাট থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাবাকে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছি। বাবার ভীষণ জমির ক্ষুধা। ফরিদপুর ভুলতে পারে না। বিঘে চারের ভালো ধানি জমি আশেপাশে কোথাও কিনেছে। মাটির বাড়িটা দেয়াল মেঝে পাকা করে ওপরে এ্যাজবেস্টাস দেওয়া হয়েছে। বাথরুম পায়খানা পাকা করা হয়েছে। ছোটভাই বি. কম পাস। অ্যাকাউন্টটেন্সির কমপিউটার ট্রেনিং সহ, হালফিল কমপিউটারের সব ট্রেনিং নিয়ে একটা চাকরিও পেয়েছে।

—অরিন্দম এগুলি সব তোমার পয়সায় হয়েছে।

—মেসোমশাই, বাবা তো কার্যকরী কিছু করছিলেন না। সবই আমার টাকায়। বাবা মা, এই বাড়ি আর জমিটা পেয়ে কী আহ্লাদেই ছিলেন। ভাইটাও বেশ সুখী ও আত্মগতভাবে পড়াশোনা চালাচ্ছিল, আর যখনই টাকার দরকার হাত আমাকে জানাত আমি পাঠাতাম। পরীক্ষা ফী, কলেজের ফী, টুইশন ফী, কমপিউটার ক্লাশের ভর্তি ও পড়াশোনা, সে-ও অনেক টাকা।

—এত টাকা তুমি জোগাড় করছিলে কী করে, সবটাই কি অটো চালিয়ে?

—ন-না, মেসোমশাই সবটাই অটো চালিয়ে নয়, তবে বেশিটাই অটো চালিয়ে। আর একটা ব্যবসা পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখান থেকে ক্ষেপে ক্ষেপে, বেশ ভালো একটা টাকা পাচ্ছিলাম ও বাবা আর ভাইকে পাঠাচ্ছিলাম। বাড়ি, জমি কেনা, বাথরুম বানানো, হঠাৎ হঠাৎ যে থোক টাকা, সবই পাশাপাশি যে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলাম সেখান থেকেই দিয়ে যাচ্ছিলাম।

—যাক, এটা তো খুউব সুখের কথা যে, অটো চালানোর সঙ্গে তুমি একটা সাইড ব্যবসা চালাতে পারছ খুবই আনন্দের কথা। তা সেটা কীসের ব্যবসা আর এখনই বা তার অবস্থাটা কেমন চলছে।

—জানেন মেসোমশাই, ভাইটা দাঁড়াল। কমপিউটার অ্যাকাউন্টেসি শিখে একটা বেশ ভালো চাকরিও পেয়ে গেল।

—তাহলে তো তোমাদের অবস্থাটা অনেক পরিবর্তন হল, তাই না। তোমার বাবা, মা-ও নিশ্চয় খুউব খুশী।

—হ্যাঁ খুউব খুশী। মা তো খুশীর তাড়নায় রক্তচাপের এমন তারতম্য ঘটালেন, যে সেটা দ্রুত মাথায় আঘাত হানল। বাবা ডাক্তার ডাকার আগেই মা চলে গেলেন।

আমার ঘুম গেছে। অরিন্দমের সঙ্গে সংলাপে, আর ট্রেনের ঝাঁকুনির তালে তালে অরিন্দমের গল্পের পাতাগুলি খোলার চেষ্টা করছি, আর এক গভীর ধোঁয়াশার মধ্যে ঢুকে পড়ছি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই ধোঁয়া আরও গভীরতর ও অন্ধকার আরও অনেক বেশি কৃষ্ণবর্ণের হবে।

—অরিন্দম, তোমার মা চলে গেলেন, হঠাৎ এত আকস্মিকভাবে। উনি কি ভুগছিলেন?

—তাই তো হয় মেসোমশাই, মা যে স্বপ্নটা লালন করছিলেন, কুপার্স ক্যাম্পের আশেপাশে বসে, সেটা যে জাল স্বপ্ন, মা সেটা যেই বুঝল, তড়িঘড়ি করে মাথার ভিতরের তার ছিঁড়ে ফেলল। আমার সফল ভাই শুধু একটা ভালো চাকরিই পায়নি তার সঙ্গে একটা সুন্দর ঝকঝকে মেয়েকে ঘরে এনে বলেছিল, বাবা এ আমার স্ত্রী। কদিন হল আমার রেজিস্ট্রি করেছি। নিজেরাই বাইরে থেকে খাবার কিনে এনেছিল। সেই খাবারই বাবা-মাকে খাওয়াল, নিজেরাও খেল। মা, কি আমার অবুঝ। মা, যার বাবাও ফরিদপুর থেকে উঠে এসেছিল, ও যে নিজে কুপার্স ক্যাম্পের হা হা করা কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যে দৈনন্দিন ত্রাস, খুন, সংঘর্ষ ও রুটি জমির প্রতি মুহূর্তের লড়ায়েই বিকশিত, কিন্তু যার জাল স্বপ্নগুলি খেলা করছিল, মেসোমশাই, আমাকে ও আমার ভাইকে ঘিরে। আমার সেই ভাই, পিঠে লটকানো ল্যাপটপটা রেখে, যা কিনা আমার ব্যবসা থেকে পাঠানো টাকায় কেনা, তার বৌয়ের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে আমার মায়ের মাথায় অদৃশ্য মুগুর চালিয়েছিল। ভাই মা বাবাকে বলে গিয়েছিল, আমার শ্বশুর - শ্বাশুড়ির এই একই মেয়ে। তা ছাড়া ওর অফিস ভবানীপুর পাড়ায়। ওর বউও একটা অফিসে চাকরি করে। ওর শ্বশুরবাড়ি টালীগঞ্জে। এখন থেকে ওর ওখানেই থাকবে। ও মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবে। দরকার হলে ওকে জানাব, ও এসে টাকাপয়সা দিয়ে যাবে।

—মেসোমশাই, আমার মা, এই এত বিস্ময়ের মধ্যেও যেন বা স্বগত বলে উঠেছিল, ''ছোট্ট খোকা, তুই এখানে আমার সঙ্গে থাকবিনে।''

—ন -না, কুপার্স ক্যাম্প বল বা রানাঘাটের কথা বল, আর আমার এখানে থাকা চলবে না। বৌকে নিয়ে চলে গেল।

আমার অবুঝ মা, তখন জাল বুনছিল, ঘরের ছাদে কুমড়োর ডগা উঠে ছাদ ভরিয়ে ফেলেছে। ছোট্ট জমিটায় লঙ্কা, বেগুন, পেঁয়াজের কলিতে ভরে উঠেছে। একটা কলমের নারকেল গাছ বুনো নারকেলে ভরে উঠেছে। ভেবেছিল ছেলের বিয়ে, মানে বরণডালা নিয়ে নববধূকে বরণ করবে, আশপাশের পড়শিদের ডাকাডাকি করবে, উলুধ্বনি, শাঁখবাজবে, ছোট করে হলেও কুপার্সের আশেপাশে হাওয়ায় একটা উতরোল ভাব আসবে। বেচারা মা, তার দিনদুয়েকের মধ্যে প্রবল ব্রেন স্ট্রোকে দিব্যি চলে গেল। বাবা এখনও ঘোরের মধ্যে। স্মার্ট ছোট ছেলে, সুন্দরী বৌ নিয়ে ঘরে এসেছে। ছোট বেলায় পিঠে ঝুলছে ল্যাপটপ, সেখানে বিশ্ব খেলা করছে, আপেল, ইয়াহু, মাইক্রোসফটের আঙিনায়। বাবা তার নিজের ছোট ছেলে , যেন উনারই ছেলে সেটা বুঝতেই তার ঘোর লেগে যাচ্ছিল। ফরিদপুরের এই চাষী ঘরের লোকটা বুঝল, ছোট ছেলে যখন বৌকে রিক্সায় তুলে রানাঘাট স্টেশনের দিকে রওনা দিল।

—তার মানে তোমার ভাই, বিয়ে না করে, বাবা-মাকে রানাঘাটে রেখে, বৌ নিয়ে সোজা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে গিয়ে উঠল। তার মানে, অরিন্দম, তোমার ভাই একেবারে অঙ্ক কষে, সেই রকম একটা অবস্থা তৈরি করে, বৌয়ের মুখটা দেখিয়ে, যেখানে কেটে পড়ার দরকার, সেটাই করল, আর এই ভয়ের জন্য তুমি, নিজে পড়াশোনা স্থগিত রেখেছিলে, এখন সেখানে যাযাবরের মতো ঘুরলে। তারপরে অটো চালিয়ে ও একটা ব্যবসা পাশাপাশি চালিয়ে, একাধারে সংসার ও ভায়ের শিক্ষাদীক্ষা, কমপিউটার স্পেশাল কোর্স এমনকি একটা ল্যাপটও কিনে দিলে, আর সেই ভাই কিনা, এখন অদৃশ্য মুগুর চালাল, তোমার বাবা, মায়ের মাথায়। বাবা কোনওরকমে সহ্য করে টিকে গেলেন, আর না পারলেন না।

কথাগুলি অরিন্দমকে বললাম বটে, কিন্তু অরিন্দমের কাহিনীর এই বিপর্যস্ততা কতখানি গভীর সেটা অরিন্দমই বুঝতে পারছে। ট্রেনের দোলানির মধ্যেও অরিন্দমের গল্প শুনেছি শুয়ে শুয়ে। অরিন্দম, এক হাত দুরে, উঠে বসে আমাকে গল্প শোনাচ্ছে। আমি চাদরে শরীটা ঢেকে, আধো আলো-আঁধারির মধ্যেও অরিন্দমের ক্ষত-বিক্ষত স্বপ্ন থেকে উৎসারিত রক্তের চুঁয়ে পড়ার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। রক্তের এই চুঁয়ে পড়া টপটপ, শব্দস্থানই আমার স্বদেশ। আমরা অনেকেই রক্তপাত , জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে থেকে, কেউ কেউ আমার ওপরের, বা আরও দুই-তিন সারির ওপরের উঠোনে উঠে পড়েছি। অরিন্দম যখন তিল তিল করে, কুপার্স ক্যাম্পের কাছাকাছি বাড়ির উঠোনটা ঘিরে স্বপ্নের বিন্দুগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করছিল, আর সেখানে সেই স্বপ্নের পরিমণ্ডলে অরিন্দমের সবচেয়ে স্বপ্নিল বড় বিন্দুটাই ছিল ভাই, ভায়ের উত্থান। ও বাবা, মা বাড়ির উঠোনের লঙ্কা গাছে জল দিতে দিতে, কুমড়ো লাউয়ের ডগাটা বাঁশের কঞ্চিতে জড়িয়ে এ্যাসবেসটরের ছাদের উপর উঠিয়ে দিতে দিতে, ওর বাবা আশেপাশের পুকুর বা চুর্ণীর জলে..., জালে ধরা ছোট মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে খেতে, ছোট ছেলেটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, আর অরিন্দমের ছোট ভাইটাও তখন স্বপ্নের এক অন্য গণিত কষতে কষতে দ্রুত সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে মাইক্রোসফট, কমপিউটার অ্যাকাউনটেনসি, ট্যালি, ইয়াহু, নানাবিধ শব্দ ও জ্ঞানের সঙ্গে এক নারীর শরীরের ঘ্রামের মধ্যে উৎসারিত হয়ে, কুপার্স ক্যাম্পের ছবি মুছে দিয়ে টিউব রেলের মধ্যে দিয়ে, কলকাতার ময়দানকে মাথায় রেখে টালীগঞ্জের কুঁদঘাটে ভেসে উঠল। বেচারা অরিন্দম তখন হরিয়ানায় দ্বিগুন জোরে আটো চালাচ্ছে ও সাইডে একটা ব্যবসা করছে। বেচারা অরিন্দমের ব্যবসাটা কী জানতে হবে।

—অরিন্দম, সত্যি ব্যাপারটা এত দুখের, কিন্তু জানো আজকাল প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা শোনা যায়। বাড়তি দাবি মেটাতে, ভাইয়ের সমস্ত আবদার পূরণ করতে, তার পড়াশোনা প্রয়োজনীয় লেবেল অবধি চালালে।

অরিন্দম প্রশ্নটা শুনে প্রথমে খানিক চুপ করে থাকে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর নিজের ভিতরে এক ঘনায়মান দুঃখের কম্পন, যা অনেক্ষণ ধরেই অনুভব করছিলাম, সেটা যেন আরও বেশি তীব্র বোধহয়। ব্যবসার কথাটা জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হল না!

আরও কিছুটা সময় যায়। অরিন্দম জলের বোতলের ছিপিটা খুলে অনেকটা জল পান করে।

মেসোমশাই, মা, বাবার কথাই ভাবছিলাম। মা তো আচম্বিতে চলেই গেলেন। বাবার কী করুণ অবস্থা। যাকগে সে কথা, আপনি জানতে চাইছিলেন, আমি কি ব্যবসা করি। এতদিন ধরে, ভাইকে বি. কম পাশ করানো, কমপিউটারের যে কটা ট্রেনিং বা কোর্স আছে সেগুলিকে কমপ্লিট করানো, এ ছাড়া বাবার হাতে প্রতি মাসে সংসারের টাকা পাঠানো, মেসোমশাই, আপনি তো বোঝেনই এগুলি মেটানো, অন্য এক লোকের অটো চালিয়ে সম্ভব হত না। তাই সব সময়ই কিছু না কিছু, সাইডে করেই গেছি। কিন্তু কত আট-ন বছর ধরে যেটা করছি, এই ব্যবসাটাই আমাকে রানাঘাটের সমস্যাগুলি মেটাতে খুউব সাহায্য করেছে। অরিন্দমের ম্লান শুকনো মুখটার মধ্যে এক বিষাদময় হাসি ফুটে ওঠে, জানেন মেসোমশাই, ভাইটা যেদিন ফোন করে জিগ্যেস করল, দাদা ল্যাপটপটার জন্য টাকা পাঠাতে পারবি তো, আমি খুউব আশা করে আছি। তিরিশ হাজার টাকায় পাব, ভদ্রলোক এটা বিক্রী করে নতুন কোনও একটা কিনবেন। এ

রকম সুযোগ পাওয়া যাবে না। আর একটা ল্যাপটপ থাকলে আমি এক্ষুনি চাকরি না পেলেও, অন্য প্রাইভেট কাজ করতে পারব।

—আমার তখন শেষবার সিরিঞ্জে রক্ত টানছে। এই রক্তটা স্টোর হয়ে গেলে, বিদেশে চলে যাবে। সিরিঞ্জে রক্ত টানছে, আমি অন্য হাতে মোবাইলে ভাইয়ের আকুলিবিকুলি শুনে যাচ্ছি। আমার প্রিয়তম ভাই, ওর জন্যই তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি বললাম, ভাই কাল টাকা তোর অ্যাকাউন্টে ফেলে দেব। জিনিসটা দেখেশুনে কিনবি। টাকাটা যেন জলে না যায়। ভাই আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞতায় মাখামাখি স্বরে বলে, দাদা তোর এই সব টাকা আমি চাকরি পেলেই শোধ করে দেব। মেসোমশাই, এই রক্ত নেওয়া হলে, আমি চেক আউট করে বেরিয়ে যাব। ভাইয়ের টাকা যাগাড়ের জন্য এবার বড় study নিয়েছিলাম।

এবার আমি চাদরটা ফেরে দিয়ে উঠে অরিন্দমের মুখোমুখি বসি। অরিন্দম, রক্ত বিক্রি করে এতদিন ধরে একসব করছে। নিজের রক্ত বিক্রি করে। কত রক্ত তোমার শরীরে আছে। আর তার দামই বা কত। তোমার তো মরে যাবার কথা, তুমি করেছ কি। আমার ব্যস্ততা বা উদ্বেগের প্রকাশে, অরিন্দম ম্লানভাবে হাসতে থাকে। ও হাসে, আমি সামনে বসে ছেলেটিকে দেখছি, আর কত বিস্ময়করভাবে সংগ্রামের ফসলটা নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে অন্যত্র সরে পড়ে, সেটাই ভাবছি। ম্লান হাসির মধ্যে অরিন্দম বলে, মেসোমশাই আমি রক্ত বিক্রি করে এত কিছু করিনি; বা বলা যায়, মানুষের রক্তের এত দাম নয়। আর তা ছাড়া এত ঘন ঘন তো আমি রক্ত বিক্রিও করতে পারব না। তবে হ্যাঁ আমি রক্তই বিক্রি করেছি অল্প অল্প করে। স্বদেশে ও বিদেশে দু-জায়গায়ই আমার রক্তের চাহিদা ছিল।

—অরিন্দমের কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়। একবার বলছে, রক্ত বিক্রি করে নয়। আবার বলছে, আসলে রক্তই বিক্রি করেছি।

—অরিন্দম একটু পরিষ্কার করে বলো, ঠিক ধরতে পারছি না।

—মেসোমশাই, আমি সাবজেক্ট ছিলাম— কীসের সাবজেক্ট, কেন সাবজেক্ট। মানে একটা অন্য বাজে চিন্তা খেলে গেল। সমাজ তো যেভাবে পালটাচ্ছে। কিন্তু ওর মুখ, কথাবার্তা, কাহিনী বা গাথার বর্ণনা, এসব ভেবে, আবার নিজের বাজে ভাবনাটার জন্য লজ্জা লাগল।

—তো অরিন্দম কীসের সাবজেক্ট।

—কেন মেসোমশাই আপনি সাবজেক্টের নাম শোনেননি; মানে এই সাবজেক্টের ব্যাপারেটা জানেন না। ওরা ভীষণ ভালো পয়সা দেয়

—সাবজেক্ট তো মানে বিষয়— কোনও বিষয় অরিন্দম।

—আরে মেশোমশাই, আমি সাবজেক্ট। মানে বলতে পারেন গিনিপিগ।

—অরিন্দমের কথা ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে। রক্ত, সাবজেক্ট, এখন আবার বলছে গিনিপিগ।

—গিনিপিগ কেন?

—আমি —আমিই সাবজেক্ট বা গিনিপিগ।

—তুমি সাবজেক্ট বা গিনিপিগ কেন। একটু খুলে পরিষ্কার করে বলো।

—শুনুন মেসোমশাই, এই ব্যাপারটা বোধ হয় আমি তোমন শোনেননি, আপনাদের ওদিকে ওটা তেমনভাবে চালু নয়। হরিয়ানা বিশাল বিশাল, দেশী-বিদেশী কোম্পানী আছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য রিসার্চস লেবরেটরি। এই লেবেরেটরিগুলি আসলে বকলমে, ও ই দেশী-বিদেশী ঔষধ কোম্পানিরই আমি বা আমার মত— লোকেরা সাবজেক্ট। আমি একটু মজা করে বললাম গিনিপিগ। আসলে গিনিপিগই। ওঁরা ওদের লেবেরেটরিতে আমাদের ভর্তি করে নেয়। তারপর সেখানে যত্ন করে রাখে, খাওয়ায়, দাওয়ায় আর মেডিকেশন করে। আর থেকে থেকে অল্প অল্প করে রক্ত নেয়। সেই রক্তগুলির স্যাম্পলিং বিদেশেও পাঠানো হয়।

এখন অরবিন্দের কথার একটি মানে বা ধারণা, আমি যেন ঠিকঠাক করতে পারছি। সাবজেক্ট বা গিনিপিগ কথাটি মনে হচ্ছে অরিন্দম যথার্থ বোধেই প্রয়োগ করেছে। আসলে, এ ব্যাপারটার কথা শুনেছিলাম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে মনে হয় এটার প্রসার কম। এটা ঠিক কভীবে হয়, সেটাই ঠিক জানি না। কিন্তু সামনেই একজন সাবজেক্ট। আহো মানবের কী নাম হয়েছে। সাবজেক্ট। কিন্তু অরিন্দম, নিজেকে গিনিপিগ ভাবে। ইভোলিউশন, কী চমৎকারভাবে কাজ করছে। অরিন্দমের বাবা মা, তস্য পিতা, মাতা পূর্ববঙ্গে মাটি ছানছিল, মাছ ধরছিল...ফরাচ্ছিল। এক গ্রামীণ মানুষ নদীর পাড়ে বাড়ি ছিল। অরিন্দমের ঠাম্মা, হয়তো কুপির আলোয়, সন্ধে বাতি জ্বালি, শঙ্খ ফুঁ দিয়ে, চৌকাঠে বসে গুনগুন করলি, হরি দিন তো গেল, সন্ধে হল, পার করো আমারে। কিন্তু...বা নিয়তি, যাই বলো না, কেউ অন্যভাবে ছক সাজাচ্ছিল। রাতারাতি, যেন পাঁচ মিনিটের টর্নাডো হয় না অনেকটা এই রকম, রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প—ওর কানভাসে ওরা মানুষই রইল— কিন্তু উদ্‌বাস্তু মানুষ। এরপর অরিন্দম এলো যার দেশ হল কুপার্স ক্যাম্প। ভাইকে দাঁড় করাতে সংসারের চাকা অন্যভাবে ঘোরাতে দেশান্তরী হল। ঘুরতে ঘুরতে গেল অটৌচালক ও সঙ্গে একটা সাইড ব্যবসা এবং ক্রমান্বয়ে হয়ে গেল সাবজেক্ট মানুষ বা অরিন্দম যেটা বলতে চায় গিনিপিগ মানুষ।

—মেসোমশাই ওরা কিন্তু আমাদের রাজার হালে রাখত। তবে ওখানে সাবজেক্ট হতে গেলে, প্রাথমিক ধাপটা পেরোলেই— তবে অন্যান্য ধাপগুলি আরম্ভ হয়।

রাত এখন চারটে হবে। আচমকাই চা-ওয়ালা এসেছিল। আমি ও অরিন্দম চা খেয়ে নিই। কামরার মানুষ এখনও কম্বল চাদরে আবৃত হয়ে দোলানির মধ্যে গভীর নিদ্রায় রয়েছে। চাঁ'টা পান করার পর বলি—অরিন্দম তুমি একটু ডিটেলসে বল, কীভাবে তুমি সাবজেক্ট বা গিনিপিগ হতে, আবার ঘুরে অরিন্দম হয়ে উঠতে।

—মেসোমশাই ব্যাপারায় অনেকগুলি ধাপও পরীক্ষা আছে। সেটা পার হয়েই আপনি সাবজেক্ট হতে। পারবেন। দুন একদল মানুষ, পঞ্চাশ, একশো, কখনও বা তারও বেশি এল। প্রথমেই তাদের ইউরিন টেস্ট হবে। এই ইউনিরন পরীক্ষায় পাশ হলে, তাকে ডাকা হবে চেকিং-এ। এই ইউনিরন পরীক্ষার ধাপকে বলে স্ক্রীনিং। এই স্ক্রীনিং -এ পাশ হলে ওকে ডেকে নেওয়া হবে চেকিং-এ ই চেকিং-এর সময়ে, এই লেবেরেটারির নিজস্ব কিচেন থেকে ওদের লাঞ্চ দেওয়া হবে। এরপর একটা সময় পার কের ওদের ইউরিন পরীক্ষা করে, ক্লিনিকস-এ ঢোকানো হলে নাস্তা, লাঞ্চ, ডিনার দেওয়া হবে। এরপর দিন থেকে ব্রেকফাস্ট, তারপরেই রক্ত দেওয়া—এটাকে

বলে ডোজিং—তারপর মেডিসিন খাওয়ানো হয়। একটার সময় লাঞ্চ এবং লাঞ্চের আগেও রক্ত নেওয়া হবে। এরপর সন্ধ্যাকালীন নাস্তার আগে ও পরে রক্ত টানা হবে। এরপর আবার ডিনারের আগে ও পরে রক্ত টানা হবে। রাত নটা-দশটায় রত নেওয়া হয়। কখনও কখনও মধ্যরাতে স্টাডির রকম ফেরে রক্ত নেওয়া হয়। এরপর তৃতীয় দিনে চেক আউট—সাবজেক্টরা চলে গেলেন। মানে ওই স্টাডিটা শেষ হল।

—এরমধ্যে যে মেডিকেশন করা হয়, তাতে আমাদের ইমিডিয়েট কোন কোন রিঅ্যাকশন হত। আমিইতো কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে গেছি। আবার ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়েছি। ডাক্তার, ডায়টেসিয়ান, ডাস্টোজিল এক বিরাট টিমে থাকে। কোন কোন মেডিকেশনের পরে প্রবল বমি হয়, বা হতে থাকে। অনেক শক্ত লোককে দেখেছি তাতে কাবু হয়ে পড়েছে। স্টাডি চলার সময় অনেককে ভয়ে স্টাডি ছেড়ে চলে যেতেও দেখেছি। আমি বেশ কয়েকবারই মেডিকেশনের পর প্রবল বমিতে ভুগেছি।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম সাবজেক্ট বা গিনিপিগের কাহিনী, আর গ্রোথরেটের বয়ানটা মাঝে মাঝে ঝলক মেরে যাচ্ছিল।

—তোমাদের কি পরিমাণ অর্থ দেওয়া হত।

—অর্থটা মেসোমশাই খারাপ দিত না। সেটা নির্ভর করত স্টাডির ওপর। কোন কোন স্টাডি তিন চার হাজার। কোন কোন স্টাডির জন্য সাত থেকে নয় হাজার টাকা। কোন কোন স্টাডির জন্য বারো থেকে পনেরো, কখন আঠারো বা কুড়ি হাজার টাকা দিত। তিন, সাত দশ বা পনেরো দিন পর্যন্ত কোনও কোনও স্টাডি কনটিনিউ করত।

—এই মেডিকেশনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কী হত তা জানতে পারতে।

—না-না, সে সব জানা যেত না। মানুষগুলোও সব বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে জড়ো হত। কেউ কেউ অনেকদিন ধরে মেডিকেশনে আছে, তাদের পরবর্তীকালে কার কী হচ্ছে জানা সম্ভব হত না। কারণ ওখানে একটা গোপনীয়তার ব্যাপারও ছিল। লোকগুলো চেক আউট করে যাবার পর ওদের মধ্যে খুব কম জনের পারস্পরিক যোগাযোগ থাকত। তবে অনেকের পার্শবর্তী ক্রিয়া হয়েছে আমার শুনেছি। কারও কারও অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ হয়েছে। কিন্তু কি কারণে, সেটা কখনই সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হত না। ধরুন আমি তো এখন পুরনো সাবজেক্ট। আমি দেখেছি কোনও কোনও স্টাজি একমাস ধরেও চলতো। কোন বিশেষ স্টাডি, পর পর পাঁচদিন ঔষধ খাওয়াল। রক্ত নেওয়া একদিনই, পাঁচদিন পর এই ধরনের স্টাডিতে শরীরের উপর মনে হত প্রবল ধকল চলত। পাঁচদিন পর রক্ত নিয়ে, হাতে ক্যাশটাকা দিয়ে চেক আউট করে দিত। একটা স্টাডি ছিল, সকালে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ এর মধ্যে জল খাওয়া ও পেচ্ছাপ পর্যন্ত বারণ। মেসোমশাই আমি ভেতর থেকে শুনেছি এসব স্টাডির রিপোর্টের পুরোটাই আমাদের মতো সাবজেক্টের ভয়ঙ্কর চার্জ। যেটা কোম্পানী বিয়ার করতে পারে না, তাই একাজটা নাকি আমাদের দেশে করিয়ে নেওয়া হয়।

—তো অরিন্দম তুমি তো পুরনো সাবজেক্ট। একদিকে অটো চালচ্ছ, আর থেকে থেকে সাবজেক্টের বিছানায় এসে বন্দী হয়ে পড়ছ। ওদিকে রানাঘাটের বাড়িতে ছাদের অ্যাসবেসটস দেওয়া হচ্ছে, বাড়ির জমিটার মধ্যে আনাজ ফলছে, আর একজন কলকাতার কলেজে পড়াশুা শেষ করে, পিঠে ল্যাপটপ নিয়ে বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে তাদের কুঁদঘাটের বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে বসে গেল। তোমার মা সেই আনন্দ সহ্য না করতে পেরে চলে গেলেন। তোমার বাড়ির উঠোনের ফলন্ত লঙ্কাগাছ, কুমড়ো গাছ, বেগুন গাছের দিকে অলসভাবে তাকাতে তাকাতে ভাবছেন, ছোট ছেলেটা— কেমন মানুষ হইল। বসে আছেন তুমি কবে ফিরবে। অরিন্দম একটা কথা জিগ্যেস করব।

—মেসোমশাই, সেটা আবার আমায় জিগ্যেস করছেন কেন?

—তুমি যে এতদিন সাবজেক্ট বা গিনিপিগ হয়ে ক্যাশ টাকা নিয়ে চেক আউট করেছ, তোমার শরীরটা ঠিক আছে তো।

ভোর হয়ে গেছে। হকারের কোলাহল ও যাত্রীদের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কামরার নীরবতা আর থাকছে না। তারই মধ্যে আমি ও অরিন্দম জানালা দিকে আদিগন্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে, সূর্যের ছড়িয়ে পড়া আলোর রেশটা অনুভব করছি। আমার কথায়— অরিন্দম অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ম্লান হেসে বলল, ওটা আজ রাতে বলব। আজ রাতটাও তো আমরা দুজন পাশাপাশি থাকব।

সত্যি সত্যি অরিন্দমের কথামতো দিনটাও যেন দ্রুত চলে গেল। কামরায় সারাদিনের কোলাহলের মধ্যে, আমি কিন্তু সাবজেক্ট বা গিনিপিগের কথাই ভাবছিলাম। মাঝে মাঝেই আড়চোখে কখনও বা সামনাসামনি অরিন্দমকে নিরীক্ষণ করেছিলাম। দীর্ঘদিন নানাবিধ ঔষধ ওর ওপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমার কথায়— 'তোমার নিজের শরীরটা ঠিক আছে তো' —তাতে যেভাবে চুপ করে থেকে বলল— মেসোমশাই ওটা আজ রাতে বলব, তাতে যেন ওর ভালো থাকার ব্যাপারটা উপর প্রশ্নচিহ্ন এসে গেল অরিন্দমের ফ্যাকাশে শরীর ও ক্লান্ত গভীর চোখ দুটি নিরীক্ষণ করার মধ্যে সন্ধ্যে গড়িয়ে, ডিনার শেষ করে, আলো নিভিয়ে দিয়ে, যাত্রী সকল যেন কামরার মধ্যে আমার ও অরিন্দমের কথাবার্তার এক পরিবেশ তৈরি করে দিল।

—আসলে মেশোমশাই শরীটা এমনিতে ঠিকই ছিল। মাঝে কিছুদিন ধরে খুবই ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। অটো নিয়ে বের হতে ইচ্ছে করছিল না। এরই মধ্যে এক বড় স্টাডির আহ্বান পেলাম। এবারের স্টাডিটা পনেরো দিনের এবং কুড়ি হাজার টাকার ওপর পাবার কথা ছিল। যাদের ঠিক ঠিক ঠিকানা থাকে বা যারা শহরেই থাকে এবং ল্যাবরেটারির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, স্টাডি থাকলে তারা প্রাশয়ই ডাক পায়। কিন্তু মেসোমশাই, আমাকে প্রথমেই ইউরিন স্টাডি করার পরই আউট করে দিল। পরিচিত ডাক্তার বা কাস্টডিয়ানদের ধরলাম। কী ব্যাপার আমার মতো এতদিনের পুরনো সাবজেক্টকে স্ক্রীনিংয়েই আউট করে দিচ্ছেন। একজন ডাক্তার আমাকে খুব বালোবাসতেন। উনি আমাকে ওয়েট করতে বলে, দ্রুত রক্ত টেনে, লেবরেটোরিতে চলে গেলেন। ঘন্টা দুয়েক পর এসে বললেন, অরিন্দম, তোমার রক্ত এদের কাজে আর লাগবে না। তোমার রক্তে কিছু প্রবলমে আছে। তুমি বাড়ি চলে যাও ও সেখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ হয়ে এসো। আমি জিগ্যেস করলাম, আমরা কী হয়েছে, আমি কি এখানে অন্য কোনও লেবরেটারিতে রক্ত পরীক্ষা করাব। উনি না বললেন। বললেন, অরিন্দম এ শহরে আমাদের থেকে অ্যাডভান্স কোনও ল্যাবরেটাই কোনও যন্ত্র নেই। তবু আমি জিগ্যেস করলাম, আমি রাজি কেন হলাম। অরিন্দম তোমার রক্তে ভীষণ রকম প্লেটলেট কমে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, কোনও বড় ধরনের ইনফেকশন। তুমি কালই বাড়ি রওনা হয়ে যাও। কাছে টাকা না থাকলে বলো, আমি টাকা দিচ্ছি।

—আমি বুঝে যাই অরিন্দমের ভবিষৎ। প্লেটলেট ভীষণভাবে কমে যাওয়ায় কোনও কোনও অদৃশ্য সংকেত লুকিয়ে আছে সেটা

আমি জানি। অরিন্দমের ফ্যাকাশে ভাব, ক্লান্ত মুখ আমি গোড়া থেকে লক্ষ করেছিলাম। আমার আশঙ্কটাই মনে হচ্ছে ফলে যাচ্ছে। আমি সেই কামরার অন্ধকারে উলটোদিকে বসা অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর ঠাকুরদা, ফরিদপুর থেকে পলায়ন, অরিন্দমের বাবাকে কাঁধে করে, শিয়ালদহ, রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্প, অরিন্দমের জন্ম ও বিকাশ — একজন সাবজেক্ট বা গিনিপিগ—ছবির রিলের মতো দেখছিলাম।

—মেসোমশাই আমরা সকলে সাতটায় পৌঁছে যাব—তাই না।

—না-না, সকাল সাতটায় নয়। অরিন্দম, তুমি জানো না, এই ট্রেনগুলি এখন সব আট ঘন্টা, দশ ঘন্টা পরে হাওড়া পৌঁছুবে।

—কেন মেসোমশাই, ট্রেন তো কোথাও আটকায়নি।

বেচারা অরিন্দম পৌঁছুতে চায়। সময়মতো পৌঁছুতে। কিন্তু কোথায় পৌঁছুবে— ও কি ঠিক ঠিক ডেসটিনেশান জানে। হ্যায়—অরিন্দম তুমি তো বুঝতে পারছ না তোমার রক্তে কী বাসা বেঁধেছে। সাবজেক্ট বা গিনিপিগদের ডেসটিনি বা ডেসটিনেশান কী হতে পারে। বেচারা অরিন্দম— ট্রেনগুলি কেন লেট যাচ্ছে জানে কী করে—ও তো রক্ত বেচে, অটো চালিয়ে, একটা ছবি তৈরি করার স্বপ্নে বিভোর ছিল।

—মেসোমশাই, এই লেটটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে।

—বেচারা অরিন্দমের বাপ, ওর দাওয়ায় বসে ভাবাছে, ওর জালে এখনও চুর্ণী নদীর মাঠ উঠে আসে, কিন্তু ওর কোনও স্বপ্নই ওর জালে ধরা পড়ে না। ও জানে, ওর ছোট ছেলে পিঠে ল্যাপটপ লাগিয়ে কুঁদঘাটে ঘরজামাই হয়ে চলে গেল, ওর বৌ ওটা সহ্য করতে না পেরে মাথার ভিতরের তারগুলি ছিঁড়ে ফেলে, ফরিদপুরে চলে যায়। কিন্তু বেচারা জানে না ওর বড় ছেলে ওর কাছে আসছে। ওর মাছে আসছে কাচের শরী নিয়ে

—মেসোমশাই বলছেন না, কবে থেকে এই লেট আরম্ভ; কী বিড় বিড় করছেন।

—অরিন্দম, এই লেট অনেকদিন ধরে, বাষট্টি বছর ধরেই এই লেট।

—মেসোমশাই, কী উলটো পালটা বলছেন, বাষট্টি বছর ধরে।

—হ্যাঁ অরিন্দম, বাষট্টি বছর ধরে। এই সম্প্রতিক লেট হচ্ছে অন্য কারণে। তুমি কি কিছুই শোনোনি।

—না-না, মেসোমশাই এই সাম্প্রতিক লেটের ব্যাপারে আমি কিছুই ।

—আরে পাঁচটা রাজ্যজুড়ে, গিনিগিগেরা সংগ্রাম শুরু করেছে। এই গিনিপিগ বা সাবজেক্ট এরাই বা কারা।

—ওরাও তোমার মতো, ওই যে তুমি বলেছিলে, সাবজেক্ট অথবা গিনিপিগ, ওরা তারা। ওরা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। ওরা নিজেদের জমি, জঙ্গল, নদী, পাহাড়, কুঁড়েঘর থেকে বিতাড়িত হবার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ লড়াই করছে।

—মেসোমশাই, কারা এবং কীসের জন্য ওদের উৎখাত করতে চাইছে।

—ওরা বিকাশপন্থী। ওরা সাবজেক্ট বা গিনিপিগদের জীবন পালটে দেবে। বাষট্টি বছর ধরে পানীয় জল দিতে পারেনি ইউনিফায়েড কম্যান্ডে, এখন পাহাড়, নদী, জঙ্গল, কুঁড়েঘর ঝলসে দেওয়া হবে ইউনিফায়েড কম্যান্ড। কিন্তু অরিন্দম, এরপর আরও লেট হবে। আট ঘন্টার জায়গায় আটাশ ঘন্টা লেট ট্রেন রান করাতে হতে পারে।

—তাহলে মেসোমশাই, আমি ফিরে গিয়ে কী করব। আপনাদেরও তো বিপদ।

—আমাদের কোনও বিপদ নেই। ওই দ্যাখো, যার মাঝের কুপে আমার স্ত্রী ও মেয়ের কাছে যাও। ওরা আগামী বছর কোথায় বেরোবে তাও ঠিক করে ফেলেছে। আমরা যারা বাইশ কোটি অরিন্দম, আমাদের অদ্ভুত একটা কৃৎকৌশল আছে, কোনও ইউনিফয়েড কম্যান্ড, সাবজেক্ট অথবা গিনিপিগদের তুমুল প্রতিরোধের ঝড় আমাদের কিসসু করতে পারবে না। আমাদের জন্য চিন্তা করো না অরিন্দম। কিন্তু তবু আমার মনে এক গোপন চিন্তা, ভয়।

আমি সব সময় শঙ্কায় ভুগি।
কালোহস্মি লোকক্ষয় কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান সমার্হত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্তিতাঃ প্রত্যণীকেষু যোধাঃ

যদি এই সব সাবজেক্ট, গিনিপিগ, এরা যদি অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে জল-জঙ্গলে নদী, বন-বনান্তরে, ভূধর থেকে ভূধর, প্রান্তরে-প্রান্তরে গেরিলা হয়ে যায়— তাহলে আমরা কী করে বাঁচব। আমাদের এই সেট আপ আমি তো চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যাব।

তুমি ফিরে গিয়ে চিকিৎসা করো। আমি এক ডাক্তারকে চিঠি দিয়ে দেবো, তুমি কলকাতায় এসে ওনার সঙ্গে দেখা করবে। প্রথমে বাবার কাছে যাও, চিকিৎসা শুরু করো ও বাবাকে আগলে ধরে বসে থেকো—কুপার্স ক্যাম্পের ওই মাটিটুকুতে। কখনও ভুলো না তুমি একজন সাবজেক্ট অথবা গিনিপিগ।

ট্রেন চলছে, ভোর হয়ে আসছে। আর ঘুম হবে না। ট্রেনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজে, মনের মধ্যে একটাই চিন্তা ছেয়ে আছে, বেচারা অরিন্দম, এই কাচের শরীর নিয়ে নিজেকে ও বাবাকে কীভাবে আগলাবে।